ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ[১]

১৮ মে ২০১৫

[১]২৬ মে ২০১৫ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত। প্রতিবেদনটির সার-সংক্ষেপ ১৮ মে ২০১৫ তারিখে টিআইবি'র ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. এ টি এম শামসুল হুদা
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এণ্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যাণ্ড পলিসি
দিপু রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যাণ্ড পলিসি
তাসলিমা আক্তার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যাণ্ড পলিসি

গবেষণা সহায়তা
মাহমুদা আক্তার, ইন্টার্ণ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা
মোরশেদা আক্তার, কুমার বিশ্বজিৎ দাস, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. জসিম উদ্দীম, লিপি আমেনা ও মো. জাহিদুল ইসলাম; প্রকৌশলী মো: দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি, চট্টগ্রাম; টিআইবি-র রিসার্চ এণ্ড পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীসহ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত গবেষণা সহযোগীবৃন্দ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৯৫১ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। এসব নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের যথাযথ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৭ সালের ১৫ মে অভিন্ন[২] ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হলেও পরবর্তীতে দুইভাগে বিভক্ত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত হয় এবং অনির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা সিটি কর্পোরেশন দুটি পরিচালিত হয়।[৩] এভাবে অনির্বাচিত প্রশাসকদের মাধ্যমে সাত বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা ছিল কার্যত অসাংবিধানিক। তবে সাম্প্রতিককালের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা এবং তাতে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেশবাসীর মধ্যে সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার সৃষ্টি করে। টিআইবি তার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত সময়ে জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ওপর একাধিক গবেষণা পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন-কানুন ও আচরণ-বিধি কতটুকু পালন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা, যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে তিন সিটি কর্পোরেশনের সবগুলো তথা ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি (২০.৯০%) ওয়ার্ডকে জনসংখ্যা, ভোটারের আকার ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে গবেষণা নমুনা এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ২৮টি ওয়ার্ডই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়ার্ড হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। নমুনা প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বেশি প্রতিযোগিতা হতে পারে এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীদের তিনজন করে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে মোট চারজন (দুইজন সাধারণ ও দুইজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর) করে সর্বমোট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী[৪] গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

প্রত্যক্ষ তথ্যদাতার মধ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ও সম্যক অবহিত এবং তথ্য প্রদানে সম্মত মেয়র, কাউন্সিলর প্রার্থী, প্রার্থীদের কর্মী, নির্বাচনী এজেন্ট, রাজনৈতিক নেতা, ভোটার ও স্থানীয় জনসাধারণ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, আইন-শৃংখলাবাহিনীর সদস্য, সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য, নির্বাচনী কর্মকর্তা, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিসহ মোট ৮৭২ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট সংবাদ মাধ্যম ও ওয়েবসাইট।

গবেষণার আওতাভুক্ত ঘটনাগুলোর ওপর একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়। এই গবেষণায় ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর ২০১৫ সালের ৮ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ তিনটি সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রার্থী ও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

---

[২] মহাজোট সরকার ২০১১ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশকে ভেঙ্গে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বিভক্ত করে।

[৩] ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০১৫) *'সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: কিছু প্রশ্ন ও উদ্বেগ'* দৈনিক যুগান্তর, ৬ এপ্রিল।

[৪] সাধারণ প্রার্থী ৫৬ জন, সংরক্ষিত প্রার্থী ৪৫ জন।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০১১ সাল পর্যন্ত সংশোধিত)', 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০', 'সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ 'দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ সকল বিধিমালা পর্যালোচনায় কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে - নির্বাচনে প্রার্থীপ্রতি ব্যয়ের সীমা খাতভিত্তিক (যেমন পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানার সংখ্যা) সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকা; প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ও অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না রাখা; নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদের বিধান না রাখা; প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান উল্লেখ না থাকা; প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধান রাখা এবং তাদের ব্যয়সীমার ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম না রাখা; ইত্যাদি। এছাড়া 'সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালায় (২০১০) নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তি যেমন- ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদি ব্যবহার ও ব্যয় সম্পর্কে উল্লেখ নেই। সার্বিকভাবে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা কার্যত নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে।

২.২ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য

গবেষণা নমুনার অন্তর্ভুক্ত নয়জন মেয়র প্রার্থী এবং ৫৬ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী সবাই পুরুষ। মেয়র প্রার্থীদের গড় বয়স ৫৪, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের গড় বয়স যথাক্রমে ৫২ বছর ও ৪৫ বছর। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার কিছুটা বেশি হলেও অর্থাৎ নয়জনের মধ্যে পাঁচজন স্নাতক/স্নতকোত্তর ডিগ্রিধারী হলেও সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশই নিরক্ষর ও স্ব-শিক্ষিত। পেশাগত দিক থেকে সব মেয়র প্রার্থী হলফনামায় নিজেদের প্রধান পেশা ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন; অপরদিকে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা নিজেদের প্রধান পেশা হিসেবে যথাক্রমে ব্যবসা (৭৩.২%) ও গৃহকর্ম (৪৬.৭%) উল্লেখ করেছেন। মাসিক আয় হিসেবে মেয়র প্রার্থীদের গড় আয় ২৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পক্ষান্তরে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীর ক্ষেত্রে গড় মাসিক আয় যথাক্রমে চার লক্ষ ৯৪ হাজার ও এক লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। নির্বাচনী হলফনামায় সম্ভাব্য মোট গড় ব্যয় হিসেবে মেয়র, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ ৪৬ হাজার, দুই লক্ষ ৮৩ হাজার ও তিন লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা উল্লেখ করেছেন। চলমান ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় নয়জনের মধ্যে তিনজন মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, এদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৩৭টি মামলা রয়েছে, আর সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৪১.০৭ শতাংশ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ১১.১ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান রয়েছে।

২.৩ নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ লেনদেন: মেয়র পদে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য কোনো কোনো প্রার্থীকে অর্থ দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীদের সবাইকে ২০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি পর্যন্ত অর্থ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে, কাউন্সিলর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রার্থীদের একাংশ কর্তৃক অর্থ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লক্ষ হতে পাঁচ লক্ষ টাকা ও নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লক্ষ হতে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকার দুই সিটির সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রেও এক লক্ষ হতে আট লক্ষ টাকা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকার সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও অর্থের পরিমাণ জানা যায় নি।

মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, দলীয় তহবিল, উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন নেতা ও উপদেষ্টাকে প্রার্থী নিজে ও প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশ এই অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কাউন্সিলরদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র প্রার্থী, স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের একাংশকে প্রার্থী নিজে ও তাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পক্ষ হতে অর্থ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে।

মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়

সিটি কর্পোরেশনভেদে মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, নয়জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে একজন ব্যতীত সবাই তাদের ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। উল্লেখ্য, বিধিমালা অনুযায়ী তিন সিটি কর্পোরেশন এর জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ঢাকা উত্তরে ৫০ লক্ষ এবং ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রামের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা করে নির্ধারিত। মেয়র প্রার্থীদের ব্যয়সীমার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তিনজন মেয়র প্রার্থীই নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘন করেছেন; এর মধ্যে একজন সর্বোচ্চ ছয় কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অন্যদিকে, ঢাকা দক্ষিণের তিনজন মেয়র প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়সীমা অতিক্রম করলেও উত্তরের শুধু একজন প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে ছিলেন। উল্লেখ্য, ঢাকা উত্তরের একজন মেয়র প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং ঢাকার দক্ষিণের একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মেয়র প্রার্থীদের গড় ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীরা গড়ে দুই কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, অপরদিকে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণের প্রার্থীরা গড়ে যথাক্রমে এক কোটি ৬০ লক্ষ ও দুই কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনভেদে মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা তিন সিটি কর্পোরেশনেই বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থী অপেক্ষা বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন। ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা গড়ে তিন কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ছয় কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অপরদিকে, বিএনপির প্রার্থীরা ঢাকায় গড়ে এক কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রামে এক কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীরা যথাক্রমে ঢাকায় গড়ে ৮৩ লক্ষ ও চট্টগ্রামে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের খাতওয়ারি হার: তিন সিটি কর্পোরেশনে খাতভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, পোস্টার ও লিফলেট বাবদ সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে ঢাকায় মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ২৮.৮ শতাংশ অর্থ এবং চট্টগ্রামে ২৭.৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে। এছাড়া নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করে চট্টগ্রামে মেয়র প্রার্থীরা যাতায়াত ও পরিবহন (১০.৮%), জনসভা (১৭.৬%) ও মিছিল/শোডাউনে (১৪.৭%) অর্থ ব্যয় করেছেন। তবে ঢাকায় এই তিনটি খাতে অর্থ ব্যয়ের হার যথাক্রমে ৩.৭ শতাংশ, ৩.৫ শতাংশ, ৬.১ শতাংশ।

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়: প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা গড়ে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন যার পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের কাউন্সিলর প্রার্থীরা ব্যয় করেছেন গড়ে ১৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। অন্যদিকে, তিন সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা (চট্টগ্রামে ২৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং ঢাকায় ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা) বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের (চট্টগ্রামে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং ঢাকায় নয় লক্ষ ১৪ হাজার টাকা) তুলনায় বেশি ব্যয় করেছে। উল্লেখ্য সিটি নির্বাচনে সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ছিল ছয় লক্ষ টাকা।

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের খাতওয়ারি হার: ঢাকায় প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার, লিফলেট ও প্লাকার্ড (৩০.৬%) বাবদ। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রামে প্রার্থীদের সর্বাধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে ক্যাম্প স্থাপন (২১.০%) ও জনসংযোগে (১৯.৭%)।

সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়: তিন সিটি কর্পোরেশনেই আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থীরদের নির্বাচনী গড় ব্যয় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের চেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। চট্টগ্রামে আওয়ামী ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ও ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকায় আওয়ামী ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ও আট লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, সিটি নির্বাচনে সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ঢাকায় নয় লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা এবং চট্টগ্রামে ১০ লক্ষ আট হাজার টাকা।

সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের খাতওয়ারি হার: ঢাকায় প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার ও লিফলেট (২৬.৩%) এবং কর্মী ও এজেন্ট বাবদ (১৪.৪%)। অন্যদিকে, চট্টগ্রামের প্রার্থীদের সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন ক্যাম্প স্থাপন (২১.২%) ও জনসংযোগে (১৯.৮%)।

সকল প্রার্থীর আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক ৫৮ শতাংশ প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ক্যাম্পে খাবার, পানীয়, উপহার ও বকশিস প্রদান করেছেন; নির্ধারিত সময়ের আগে ও পরে প্রচারণার কাজে মাইক ব্যবহার করেছেন ৪২ শতাংশ এবং একসাথে একাধিক মাইক ব্যবহার করেছেন ৪১ শতাংশ প্রার্থী; ধর্মীয় উপসানলয়ে প্রচারকাজ চালিয়েছেন ৪২ শতাংশ প্রার্থী। এছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে জনসভা (৪০%), মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শো-ডাউন (২৬%), যানবাহন সহকারে মিছিল ও শো-ডাউন (২৩%), প্রার্থীদের পক্ষে প্রকাশ্যে ও গোপনে চাঁদা দেওয়া (২০%) ইত্যাদি ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

২.৪ তিন সিটি নির্বাচনে অংশীজনের ভূমিকা

নির্বাচন কমিশন: কোনো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য কমিশন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পাশাপাশি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত মেয়র প্রার্থীসহ তিনটি সিটি কর্পোরেশনের কিছু সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সতর্ক নোটিশ ও আর্থিক জরিমানা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা থাকলেও কঠোর শাস্তিমূলক (যেমন- প্রার্থিতা বাতিল) ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। কমিশনের দুর্বল অবস্থানের কারণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেখা যায় নি। সেনা মোতায়েনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতার কারনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগসহ বিতর্কিত অবস্থার সৃষ্টি, কোথাও কোথাও নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ, ভোটের দিন কেন্দ্র দখল, কারচুপি, অবাধে ব্যালট পেপারে সিল মারা ইত্যাদি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের হামলার শিকার হওয়া বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার মতো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায়। সর্বোপরি নির্বাচনী আইন ভংগ করে রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন ঘোষণা করলেও সেক্ষেত্রে কমিশন কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

রাজনৈতিক দল: রাজনৈতিক দলগুলোর সরাসরি নির্বাচনী কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চিত্র লক্ষ করা গেছে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে প্রার্থীদের দলীয় সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি অনেক প্রার্থী যারা নিজ দলের সদস্য তাদেরকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে দলটির সংসদ সদস্যসহ নেতা-কর্মী (স্থানীয় ও বহিরাগত) দ্বারা ব্যাপকভাবে ভোট কেন্দ্রসমূহের একাংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রকাশ্যে সিল মারাসহ বিভিন্নভাবে ভোট জালিয়াতি এবং এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে দল সমর্থিত প্রার্থী ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে যা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে দেয়নি। এছাড়া প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় ও অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। যেমন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বিএনপির নির্বাচনী এজেন্ট ও কর্মী না দেওয়া, মেয়র প্রার্থীদের মতামত না নিয়ে ভোটের দিন নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা যা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী: কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় পদক্ষেপ না নেওয়া এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালনসহ কোথাও কোথাও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

নাগরিক সমাজ ও সংগঠন: তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে যেহেতু সকল মহলের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল সেহেতু নাগরিক সমাজও এই নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। তারা প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহার, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ইত্যাদির ওপর বিশ্লেষণমূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করেছে, সঠিক প্রার্থী নির্বাচন, প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান গোলটেবিল আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে নাগরিক সমাজের দুইটি অংশ দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায় যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে।

ভোটার: নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারদের কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভোটারদের অনেকে ভোট দিতে পারলেও অনেক ক্ষেত্রে জাল ভোট প্রদান ও বাধার মুখে কেউ কেউ ভোট দিতে পারে নি। তাছাড়া নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের জন্য ভোটারদের প্রার্থীদের আয়োজনে ভোট কেন্দ্রে আসা এবং ভোটের আগের দিন রাতে বিভিন্ন বস্তি ও কলোনীতে প্রার্থী কর্তৃক বিতরণকৃত অর্থ নিম্ন আয়ের লোকজন দ্বারা গ্রহণ লক্ষণীয়।

সংবাদমাধ্যম (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট): তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব ভূমিকার মধ্যে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহারের তথ্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম ও আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা, নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য অংশীজনের কর্মকাণ্ড প্রচার ও প্রকাশ করেছে। বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান এ ধরনের কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে প্রধান দুটি দলসমর্থিত মেয়র প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ অন্য প্রার্থীর তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীতে অন্য প্রার্থীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্বাচনের দিন কেন্দ্রভিত্তিক অনিয়ম তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কার্যত একটি দলীয় নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন ও সমর্থন দান, প্রার্থীদের পক্ষ থেকে দলীয় সমর্থন নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা, সরকারের পক্ষ থেকে সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি ঘটনা এক নির্বাচনেরই বহিঃপ্রকাশ। এছাড়া ভোটকেন্দ্রে বিরোধীদল সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্ট ও দলীয় সমর্থকদের ব্যাপক অনুপস্থিতি এবং দলীয় নির্দেশনায় নির্বাচনের দিন মধ্যপথে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের ঘটনা নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যকে বিতর্কিত করে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করতে ব্যর্থতার পরিচয় পরিচয় দিয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা দেখাতে না পারা, নির্বাচনী আইন সব প্রার্থীর জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না হওয়া, আচরণ বিধি লঙ্ঘনে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের কারণে নির্বাচনে সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর কর্মকর্তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। প্রার্থীদের পক্ষ থেকেও আচরণ বিধি মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রার্থী কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও আচরণবিধি লঙ্ঘন লক্ষণীয়। সার্বিক বিবেচনায় তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না।

সুপারিশমালা

১. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার ও হালনাগাদ করতে হবে-
   - সকল প্রার্থীর নির্বাচনী সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা খাত অনুযায়ী (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ) নির্দিষ্ট করতে হবে;
   - নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের বিধান রাখতে হবে;
   - নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
   - সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের ব্যয়সীমা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে;
   - প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান রাখতে হবে;
   - সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকে নির্বাচনী বিধির আওতায় আনতে হবে।

২. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. ভোট জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে।

৪. নির্বাচন কর্মকর্তা (প্রিজাইডিং, রিটার্নিং, ও পোলিং কর্মকর্তা) এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ভোট কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সহজ প্রবেশাধিকারসহ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক প্রভাব ও বাইরের চাপ উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনের মত যোগ্য ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দিতে হবে।

৭. অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে তার সাংবিধানিক ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

.....